

ইরানের উপর আক্রমণ কেবল সাম্রাজ্যবাদ, ভূরাজনীতির ব্যাপার নয়

Posted on March 21, 2026 by Sushovan Dhar

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক হামলার মধ্য দিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে এক নতুন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। তেহরান সহ একাধিক শহরে বিমান হামলা ও ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে সামরিক ও কৌশলগত ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা হয়েছে, নিহত হয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই এবং শাসকগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তি। এর জবাবে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। ফলে সংঘর্ষ দ্রুত আঞ্চলিক মাত্রা পেতে শুরু করেছে। পারস্য উপসাগরের সামরিক উত্তেজনা, লেবাননের সীমান্ত সংঘর্ষ এবং জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা এই যুদ্ধের সম্ভাব্য বিস্তারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তবে এই সংঘর্ষকে একটি আকস্মিক সামরিক সংঘাত হিসাবে দেখা ভুল হবে। এটি আসলে দীর্ঘদিন ধরে জমে ওঠা ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বিস্ফোরণ। মধ্যপ্রাচ্যে

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যত একক বিশ্বশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই সময়ে পশ্চিমা রাজনৈতিক ভাষ্যে ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থা’-র কথা বলা শুরু হয়। এই ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল মূলত নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন— পুঁজির অবাধ বিস্তার, মুক্ত বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংহতি। অনেকেই বলেছিলেন, বাজারের প্রসার এবং অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংঘাতকে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনবে। কিন্তু এই কাঠামো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিশ্বায়নের সেই প্রতিশ্রুত স্থিতিশীলতা বাস্তবে খুবই ভঙ্গুর। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট প্রথম বড় ধাক্কা দেয় এই ব্যবস্থাকে। তার পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় ঋণ সংকট, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান সেই সংকটকে আরও গভীর করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চরিত্রও ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। বাজার ও বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের যে কৌশল ১৯৯০-এর দশকে প্রাধান্য পেয়েছিল, তার জায়গায় ক্রমশ ফিরে আসে ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক উত্থান, রাশিয়ার সামরিক পুনরুত্থান এবং ইউক্রেন যুদ্ধ সেই পরিবর্তনকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ফের এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং সামরিক শক্তির রাজনীতি একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এই নতুন বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতেও একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যার কেন্দ্রে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য। কারণ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল ও গ্যাস ভাণ্ডার এই অঞ্চলে অবস্থিত। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ— বিশেষত হরমুজ প্রণালী ও সুয়েজ খাল— এই অঞ্চলেই। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শুধু আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্যেও ভীষণ জরুরি।

এর পাশাপাশি গত তিন দশকে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপরেখা অনেকটাই বদলে গেছে। তেল এখনো গুরুত্বপূর্ণ হলেও, উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি তেলের উদ্বৃত্ত আয়কে ব্যবহার করে তাদের অর্থনীতিকে বিভিন্ন মাত্রায় পুনর্গঠন করেছে। বিশেষত সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কাতার কিংবা সৌদি আরবের মত রাষ্ট্রগুলি ধীরে ধীরে নিজেদের শুধু জ্বালানি রফতানিকারক অর্থনীতি হিসাবে নয়, বরং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলেছে। দুবাই, দোহা বা রিয়াধ এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আর্থিক পরিষেবা, পর্যটন, পরিবহন এবং উচ্চ প্রযুক্তি পরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বৈশ্বিক পুঁজির প্রবাহ, আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন, সমুদ্র বন্দর এবং আর্থিক পরিষেবার জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই শহরগুলি এখন একেকটি বৃহৎ অর্থনৈতিক কেন্দ্র।

এই রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কৌশল কাজ করেছে। তেল থেকে আয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা যে স্থায়ী নয়, তা উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল। ফলে তারা ওই বিপুল আয়ের একটি অংশ অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ করেছে। উপসাগরীয় অঞ্চল আজ এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসাবেও কাজ করছে। এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক গুরুত্বও নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে গত দুই দশকের ঘটনাগুলি যদি একসঙ্গে দেখা যায়, তবে একটি স্পষ্ট ধারাবাহিকতা চোখে পড়ে। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ, ২০১১ সালে লিবিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ, সিরিয়ার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং এখন ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘর্ষ— সবই মধ্যপ্রাচ্যের শক্তির ভারসাম্যকে পুনর্গঠনের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

অবশ্য এই প্রচেষ্টা সবসময় পরিকল্পনামাফিক এগোয়নি। ইরাক যুদ্ধের পরবর্তী অস্থিরতা, সিরিয়ার জটিল গৃহযুদ্ধ কিংবা লিবিয়া রাষ্ট্রের ভাঙন দেখিয়েছে যে সামরিক হস্তক্ষেপ প্রায়ই এমন অনিশ্চিত ফলাফল তৈরি করে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটটি মাথায় রেখে ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল-আমেরিকার বর্তমান আক্রমণকে নতুন ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন (পরে রাশিয়া), ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন— এই পাঁচটি রাষ্ট্রকে বৈধ পারমাণবিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অন্যদিকে বাকি রাষ্ট্রগুলিকে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। সমস্যা চুক্তির দ্বিতীয় অংশ নিয়ে। অর্থাৎ পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি। ওটি কোনোদিন বাস্তবায়িত হয়নি। বরং গত কয়েক দশকে তাদের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের আধুনিকীকরণ হয়েই চলেছে। NPT ক্রমশ বৈশ্বিক নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার বদলে পারমাণবিক ক্ষমতার এক ধরনের স্থায়ী শ্রেণিবিন্যাসে পরিণত হয়েছে।

এই দ্বৈত মানদণ্ড মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। ইজরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে NPT-তে যোগ দেয়নি, তবু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয় এমন একটি পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার তার হাতে রয়েছে। অথচ তা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে খুব কমই আলোচিত হয়। ফলে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি শুধু প্রযুক্তিগত বা সামরিক প্রশ্ন নয়। এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যের প্রশ্ন। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি অঘোষিত শক্তি ভারসাম্য হল ইজরায়েলের সামরিক প্রাধান্য, সৌদি আরব ও উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক শক্তি এবং ইরানের রাজনৈতিক প্রভাব— এই তিনটি উপাদানের মিশেল। ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনা সেই ভারসাম্য বদলে দিতে পারে।

ইরানের মতে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি মূলত একটি প্রতিরক্ষামূলক নিরাপত্তা কৌশল। বহু দশকের নিষেধাজ্ঞা, সামরিক হুমকি এবং আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিজেদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের দৃষ্টিতে এই কর্মসূচি মধ্যপ্রাচ্যের বিদ্যমান শক্তির কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। এই কারণেই ইরানের পারমাণবিক প্রশ্নকে ঘিরে সংঘাত এত দীর্ঘস্থায়ী এবং তীব্র। এটি কেবল প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নয়; বরং মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিন্যাস নিয়ে বৃহত্তর ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের অংশ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইরানের ক্ষেত্রে এই উদ্বেগ আরও তীব্র। কারণ ইরান গত চার দশকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এক জটিল প্রভাববলয় তৈরি করেছে। লেবাননে হেজবোল্লা, ইরাকে বিভিন্ন শিয়া রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করা, সিরিয়ায় আসাদ সরকার এবং ইয়েমেনে হুথি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে তেহরান কার্যত একটি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই নেটওয়ার্ককে ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র— উভয়েই তাদের আঞ্চলিক কৌশলের জন্য সম্ভাব্য বিপদ হিসাবে দেখে। তাই ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কেবল তার পারমাণবিক কর্মসূচি থামানো নয়। আরও গভীরে গেলে দেখা যাবে, লক্ষ্য হল ইরানের রাষ্ট্রক্ষমতা ও সামরিক সক্ষমতাকে এমনভাবে দুর্বল করে দেওয়া যাতে সে দীর্ঘ সময় ধরে আঞ্চলিক শক্তির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এই কৌশলকে অনেক বিশ্লেষক ‘ক্ষমতা ক্ষয়’ (strategic degradation) হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা নয়, বরং তার সামরিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার এমনভাবে ক্ষতি করা, যাতে সে ভবিষ্যতে বড় আকারের চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে না পারে।

অন্যদিকে গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখা কঠিন। গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযান, লেবানন সীমান্তে উত্তেজনা এবং সিরিয়ায় ধারাবাহিক বিমান হামলা— এই সমস্ত ঘটনাই একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাতের ধারাবাহিকতার অংশ। প্যালেস্তাইন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে দীর্ঘস্থায়ী সংকট তৈরি হয়েছে, তা ক্রমশ ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিকে পরিস্থিতিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে ইরানের বিরুদ্ধে বর্তমান সামরিক অভিযানকে শুধু একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধের একটি নতুন পর্যায় হিসাবেই দেখা বেশি যুক্তিযুক্ত।

ইজরায়েলের জন্য আদর্শ পরিস্থিতি হল এমন একটি সংঘাত, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সামরিকভাবে জড়িত। কারণ এতে একদিকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক চাপ বহুগুণ বাড়ে, অন্যদিকে আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য ইজরায়েলের পক্ষে থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই সমীকরণ সবসময় অত সহজ নয়। দীর্ঘ যুদ্ধের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এবং তার জায়গায় ধীরে ধীরে একটি নতুন শক্তির ভারসাম্য গড়ে উঠছে। সেখানে চীন, রাশিয়া, ইরান কিংবা ব্রিকস (BRICS)-এর অন্য আঞ্চলিক শক্তিগুলি মিলিয়ে একটি বিকল্প ভূরাজনৈতিক ব্লক তৈরি হতে পারে।

এই ধারণার কারণ হল গত দুই দশকে চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক উত্থান, রাশিয়ার সামরিক পুনরুত্থান এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির আত্মপ্রকাশের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত। কিন্তু এই পরিবর্তনকে একটি সুসংহত রাজনৈতিক বা সামরিক জোট মনে করা অনেকসময় অতিরঞ্জিত হয়ে পড়ে। ইরানকে ঘিরে বর্তমান সংঘর্ষ সেই সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে। কাগজে কলমে ইরান, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে সহযোগিতা রয়েছে জ্বালানি বাণিজ্য, সামরিক প্রযুক্তি, এমনকি কূটনৈতিক সমর্থনের ক্ষেত্রেও। কিন্তু সেই সহযোগিতা এখন পর্যন্ত কোনো দৃঢ় কৌশলগত জোটে পরিণত হয়নি।

চীনের অবস্থানই এই সত্যকে সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। চীন ইরানের তেলের অন্যতম প্রধান ক্রেতা এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তেহরানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে চীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। তার প্রধান বাজার এখনো যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া বেজিংয়ের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তার কৌশল তাই সাধারণত সংঘাত এড়িয়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দিকে ঝুঁকে থাকে, যাতে জ্বালানি সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক পথ— দুটিই নিরাপদ থাকে।

রাশিয়ারও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়াকে ইতিমধ্যেই দীর্ঘস্থায়ী সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের পক্ষ নিয়ে সরাসরি বড় আকারের সামরিক অবস্থানে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা বা রাজনৈতিক আগ্রহ রাশিয়ার নেই। রাশিয়া কূটনৈতিক সমর্থন বা সীমিত সামরিক সহযোগিতা দিতে পারে, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া তার ক্ষমতার অতীত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রাষ্ট্রক্ষমতার মূল কেন্দ্রগুলি থেকে সেই প্রচেষ্টার সীমা নির্ধারিত হয়েছে। ফলে ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের স্থায়ী টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে— সংস্কারের সীমিত চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা হয়েছে কঠোর রক্ষণশীল নিয়ন্ত্রণের অধীনে।

এই দ্বন্দ্ব কেবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের গভীর স্তরেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। গত দুই দশকে ইরানে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষার বিস্তার, নগরায়ন, নারী শিক্ষার প্রসার এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান— এইসব সামাজিক পরিবর্তন রাষ্ট্রের আদর্শিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিহীন, ফলে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব দৃশ্যমান। এই দ্বন্দ্বের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় ২০০৯ সালের ‘গ্রীন মুভমেন্ট’-এ এবং আরও তীব্রভাবে ২০২২ সালের ‘নারী, জীবন, স্বাধীনতা’ আন্দোলনে। মাহসা আমীনীর মৃত্যুর পর তীব্র প্রতিবাদী বিস্ফোরণ কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতিক্রিয়া নয়, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা সামাজিক ক্ষোভের উদ্গীরণ। তবে ওই আন্দোলনগুলির সীমাবদ্ধতাও ছিল। ওগুলি ইরানি সমাজের গভীর অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটালেও এখন পর্যন্ত সুসংগঠিত রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে সমস্ত সংকট সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষমতার কাঠামো টিকে থাকতে পেরেছে।

অর্থনৈতিক সংকট এই দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করেছে। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, তেল থেকে আয়ের ওঠানামা এবং আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির ফলে ইরানের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরেই চাপে রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং সামাজিক বৈষম্য সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছে বিপ্লবী গার্ড বা আইআরজিসি। সামরিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে শুরু হলেও, গত কয়েক দশকে তারা ইরানের অর্থনীতির বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র— জ্বালানি, নির্মাণ, পরিকাঠামো— নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। ফলে রাষ্ট্র, সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে এক জটিল সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

About the Author



Sushovan Dhar

Author

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint

View All Posts



Sushovan Dhar

+ posts

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint